অমরনাথ যাত্রীর ডায়েরি

রাজর্ষি পাল

জুলাই, ২০০১। হাওড়া থেকে জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস ধরে দুদিন পর নামলাম জম্মু। ভিড়ে থিকথিক করছে স্টেশন। দু-পা দূরে দূরে অটোম্যাটিক রাইফেল হাতে সেনাদের অতন্দ্র প্রহরা। অমরনাথের পথে সঙ্গী কমলেশ কামিল্যা—ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার এবং জার্নালিস্ট। কাশ্মীরে আগে বেশ কয়েকবার গেছে কমলেশ। চেনাশোনা আছে। আমরা চলেছি অমরনাথ তীর্থ দর্শনে। কাশ্মীরে আগুন জ্বলছে। জেনেশুনেই যাচ্ছি।

জম্মুতে রাত্রিবাস। পরদিন ভোরে টাটা সুমো ভাড়া করে জম্মু থেকে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা শুরু হল। পাহাড়ি রাস্তার মোড়ে মোড়ে অটোম্যাটিক রাইফেল হাতে মিলিটারি পেট্রলিং। আঙুল তুলে ভিকট্রি দেখালে জওয়ানরাও ভিকট্রি সাইন দেখাচ্ছে। রামবন বলে এক জায়গায় পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড স্পিডে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাচ্ছে কাশ্মীরি ড্রাইভার। এতটাই স্পিডে যে আমরা একজনের ঘাড়ে আর একজন উলটে পড়ছি।

রাস্তার ডানদিকে জঙ্গলে ঢাকা খাড়া পাহাড়। বাঁদিকে খাদ আর উপত্যকা। উপত্যকার ওপারে দূরে সমান্তরাল পাহাড়ের সারি। রামবন পেরনোর পর স্পিড স্বাভাবিকে নামিয়ে কারণটা বলল ড্রাইভার।

উপত্যকার ওপারে যে-পাহাড়ের সারি, ওটা পাকিস্তান। এপারে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে ক্যামোফ্লাজ করে লুকিয়ে আছে ভারতীয় সেনা। এখানে মাঝে মধ্যেই গোলাগুলি চলে। ক্রস ফায়ারিংয়ের মধ্যে পড়লে প্রাণ যেতে পারে। তাই দ্রুত নিষ্ক্রমণ আমাদের যানের।

জওহর টানেল

পীরপাঞ্জাল মাউন্টেন রেঞ্জ। জম্মু থেকে কাশ্মীরকে আলাদা করে রেখেছে পীরপাঞ্জাল পর্বতশিরা। পর্বতশিরার ভেতর দিয়ে জওহর টানেল কাশ্মীরকে যুক্ত করেছে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। দশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেল কাশ্মীর তথা ভারতের নিরাপত্তার দিক দিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। জওহর টানেল হাতছাড়া হয়ে গেলে কাশ্মীর ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এই টানেলকে কেন্দ্র করে বিশাল সেনা সমাবেশ।

ইংল্যান্ড প্রবাসী চিকিৎসক

জওহর টানেল

টানেলের ওপরে, পাহাড়ের ওপর মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল রেখে সতর্ক সেনাপ্রহরা।

জওহর টানেলে ঢোকার আগে ভীষণ রকমের চেকিং চলছে। বাস এবং গাড়ি থেকে প্রত্যেক যাত্রীকে নামিয়ে আলাদাভাবে চেকিং করা হচ্ছে। ঘেরা জায়গায় মহিলাদের নিয়ে যাচ্ছে সি আর পি এফ-এর মহিলা জওয়ানরা। প্রতিটা বাস, ট্রাক এবং গাড়ি সার্চ করছে বম্ব ডিসপোসাল স্কোয়াড। চেকিংয়ের পর টানেলের ভিতর দিয়ে দ্রুতগতিতে নিষ্ক্রমণ। টানেলের ভিতরে থামা যাবে না। ইলেকট্রিক আলোয় আলোকিত এই দীর্ঘ টানেল।

শ্রীনগর

টানেল পেরনোর পর কাশ্মীর উপত্যকা। দুপাশে পাহাড়, মাঝখানে উপত্যকার ভিতর দিয়ে পিচ ঢালা সোজা রাস্তা। দুপাশে পাইনগাছের সারি। বাতাসে বারুদের গন্ধ। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে থমথম করছে চারপাশ। ভারি হয়ে আছে বাতাস। শ্রীনগরে ঢুকল টাটা সুমো। ডাল লেকে বুকিং করা আছে হাউসবোট। রাস্তার একপাশে ডাল লেক, অন্যপাশে সারি দিয়ে হোটেল। হোটেলগুলি এককালে ছিল ঝাঁ চকচকে ফাইভ স্টার। আজ জৌলুসহীন। পরিণত হয়েছে মিলিটারি ব্যারাকে। সিনেমায় দেখা বা গল্পে পড়া স্বর্গীয় ডাল লেক আজ শ্রীহীন, ম্রিয়মাণ।

ডাঙা থেকে বেশ অনেকটা দূরে হাউসবোট। একটি শিকারা ভাড়া করে উঠলাম। দাঁড় বেয়ে শিকারা আমাদের নামিয়ে দিল হাউসবোটের গেটে। হাউসবোটের মালিক বয়স্ক কাশ্মীরি ভদ্রলোক, আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। গুছিয়ে বসতে বসতে সন্ধ্যা। বাড়িতে ফোন করে জানানো দরকার যে এখনও পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক আছে। একমাত্র উপায় ডাঙায় ফিরে গিয়ে এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করা। একটি শিকারা ভাড়া করে আমি আর কমলেশ হাউসবোট থেকে ডাঙায় উঠলাম। ততক্ষণে রাত্রি নেমেছে। খুঁজে খুঁজে বের করলাম একটি এস টি ডি বুথ। বাইরে বিশাল লম্বা লাইন। ফৌজি জওয়ানদের ভিড়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে টিমটিম করছে একটি কম পাওয়ারের বাল্ব। লাইনে দাঁড়ালাম। নানান ভাষার ভিড়ে মনে হল, কিছু একটা ব্যাপারে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। মানে বোঝা গেল না। মনে হল সামনে কারা যেন কথা বলছে বাংলায়। লাইন থেকে বেরিয়ে এলাম আমি আর কমলেশ। অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে বের করলাম।

আমাদের বেশ কিছুটা সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে সি আর পি এফ-এর দুই কমবয়সি জওয়ান। একজনের বাড়ি টালিগঞ্জে। জিজ্ঞেস করে উত্তেজিত আলোচনার কারণ জানা গেল। আজ দিনের বেলায় কুপওয়ারাতে মিলিটারি ক্যাম্পে আত্মঘাতী আক্রমণ হয়েছে। অনেকে হতাহত। অর্থাৎ আমরা যখন

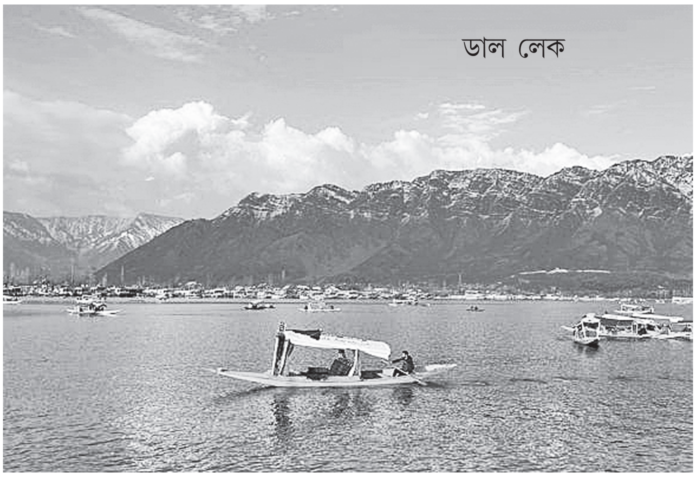

জওহর টানেল পেরোচ্ছিলাম, তখন কুপওয়ারাতে চলছিল জঙ্গি আক্রমণ।

পরদিন ভোরবেলায় যাত্রা শুরু হল। শিকারা করে আমি আর কমলেশ ডাঙায় এলাম। হাত দেখিয়ে অটো থামিয়ে ঝট করে উঠে পড়া গেল। চলন্ত অটোতেই চলল দর কষাকষি। অটোগুলো একটু বেশি সময় থামলেই সেন্ট্রি পোস্ট থেকে বেরিয়ে আসছে মিলিটারি পুলিশ। ধরপাকড় করছে। তীর্থযাত্রীদের যদিও কিছু বলছে না, তবুও উত্তেজিত পরিবেশ।

পৌঁছলাম শ্রীনগরের সেন্ট্রাল বাস-স্ট্যান্ড। খুঁজে বের করা হল পহেলগাঁওয়ের বাস। স্থানীয় মানুষ আর তীর্থযাত্রীরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে বা বসে। বেশ কয়েক ঘণ্টার বাসযাত্রা। উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তায় পথ চলা, যেন দার্জিলিং।

এক জায়গায় রাস্তার পাশে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল বাস। উলটো দিক থেকে আসছে মিলিটারি কনভয়। কনভয়ের ট্রাকের ওপর উদ্যত মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল রেখে সতর্ক জওয়ান। একটার পর একটা মিলিটারি ট্রাক হুইসল বাজিয়ে বাজিয়ে আসছে। দুপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং গাড়ি। কনভয় বেরিয়ে গেলে আবার চলতে শুরু করল বাস।

অনন্তনাগ

অনন্তনাগ পেরিয়ে চলেছে বাস। উগ্রপন্থী অধ্যুষিত জায়গা। বাস থামিয়ে অ-কাশ্মীরিদের নামিয়ে গণহত্যা করলেও আটকানোর কেউ নেই। তবে বাসের কাশ্মীরি যাত্রীদের হাবভাব দেখে একবারও মনে হল না যে তীর্থযাত্রীদের প্রতি ওঁদের বিদ্বেষ আছে।

এই অনন্তনাগ ছিল প্রাচীন কাশ্মীরের রাজধানী। নবম শতকে কল্‌হনের লেখা 'রাজতরঙ্গিণী' থেকে জানা যায় কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের ইতিহাস। ইসলামিক আক্রমণের অনেক আগের বর্ণনা। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য বাংলার গৌড় অবধি অভিযানে যান। সেই সুদূর অতীতেও কাশ্মীরের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ছিল।

পহেলগাঁও এলাম। আর যাবে না বাস। রাস্তা সরু হয়ে গেছে। ছোট গাড়িই একমাত্র যেতে পারে। কমলেশের কল্যাণে জোগাড় করা গেল একটি টাটা সুমো। সরু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চললাম। পাহাড়ের নিচে লিডার নদীর উপত্যকা। পুরনো অনেক বলিউডি সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড এই লিডার নদী বা নীল গঙ্গা।

চন্দনওয়ারি এসে থামল টাটা সুমো। আর যাবে না। ট্রেকিং শুরু করতে হবে। ভীষণভাবে চেকিং হচ্ছে। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে আলাদাভাবে চেকিং করে তবে ছাড়া হচ্ছে। ট্রেকিং শুরু হতে হতে বেজে গেল বেলা তিনটে।

আমরা রওনা হতেই সেদিনের মতন যাত্রা বন্ধ। আবার শুরু হবে পরদিন সকালে। কী কাণ্ড। আর

মিনিট পনেরো দেরি হলেই আমরাও আটকে পড়তাম। সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝতে পারি, সেটা ছিল অমরনাথজীর আশীর্বাদ। আর একদিন পরে রওনা হলে বেঁচে থেকে এই কাহিনি লেখার সুযোগ পেতাম না। সেকথা যথাসময়ে।

শেষনাগ ক্যাম্প

শুরু হল হাঁটা। পিঠে রুকস্যাক নিয়ে পাহাড়ি পথে ঊর্ধ্বাভিমুখী যাত্রা। যেন মহাপ্রস্থানের পথ। এগিয়ে চলো। পিছনে তাকাতে নেই। পার্বত্য পথ। কখনও গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, কখনও চড়াই-উৎরাই। কখনও ধীরে, কখনও খাড়াভাবে ওপরে উঠে যাচ্ছে পথ। যত উপরে উঠছি, কষ্ট তত বাড়ছে। বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব কমছে।

সারা ভারতবর্ষ মিলেছে এসে এই পথে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। যারা চলতে পারছে না তারা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। ঘোড়ার সহিসরা স্থানীয় কাশ্মীরি মুসলমান। তীর্থযাত্রীরা হিন্দু। সনাতন ভারতবর্ষ। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা।

পথে দেখি এক বয়স্ক সন্ন্যাসিনী। হিন্দুস্থানি। হাঁপানির টান উঠেছে প্রচণ্ড। কাশতে কাশতে বসে পড়েছেন। উঠতে পারছেন না। সঙ্গীরা সামনে এগিয়ে গেছে, ভ্রূক্ষেপ করেনি। এই যাত্রাপথে মৃত্যু হলে সেটাও চরম পুণ্যের কিনা!

উলটোদিক থেকে আসছে এক কাশ্মীরি ঘোড়াওয়ালা। তীর্থযাত্রীকে শেষনাগ ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে নেমে যাচ্ছে চন্দনওয়ারি। তার হাতে একশো টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম সন্ন্যাসিনীকে পরের ক্যাম্পে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দিতে। ঘোড়ায় তুলে রওনা করিয়ে দিলাম। এটুকু করে শান্তি পেয়েছিলাম। তাঁর পরিণতি আর জানতে পারিনি।

চলতে চলতে সন্ধ্যা নামল। নিঝুম হয়ে নেমে এল রাতের অন্ধকার। নির্জন পথে আমরা দুজন পথ চলছি। তীর্থযাত্রীরা যে যার মতন রাতে মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। পথ বলে কিছুই নেই। পাহাড় আর জঙ্গল। পথের ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে বরফগলা ঝরনার জল। তারার আলোতে পথ চলছি। এই পথে উগ্রপন্থী আছে কী না জানি না, তবে ভালুক বা লেপার্ডের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভবনা।

রাত আটটা। পাঁচ ঘণ্টার ওপর পথ চলছি। এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকের উপত্যকায় শেষনাগ হ্রদ। পৌরাণিক

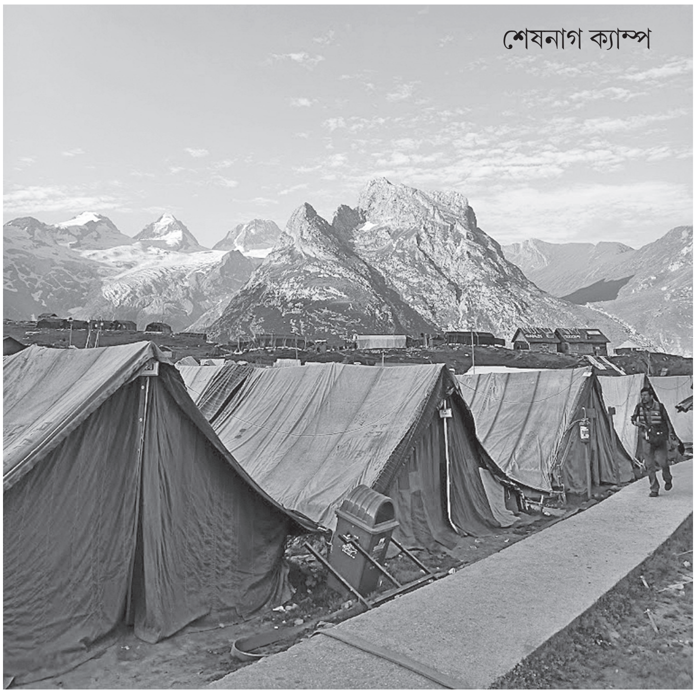
শেষনাগ ক্যাম্প

মতে বাসুকি নাগের আশ্রয়স্থল। নীলকণ্ঠ মহাদেবের গলার বাসুকি নাগ। আমরা এখন ট্রি লাইনের ওপরে। প্রায় তেরো হাজার ফুট উচ্চতায়।

তারায় তারায় ভরা অন্ধকার আকাশ। হিমালয়, উপত্যকা, হ্রদের জলে আকাশের প্রতিচ্ছবি—সম্মোহনী, মায়াবী, শীতল রাত। আমাদের উপায় নেই এই পাগল-করা সৌন্দর্য উপভোগ করার। পৌঁছতে হবে শেষনাগ ক্যাম্প। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেখানে আমাদের জন্য কী অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে কে জানে! পাহাড়ের একটি বাঁক ঘুরতে চোখে পড়ল আরও ওপরে, অনেক দূরে, একটা-দুটো আলোর বিন্দু। আরও এগোলে বিন্দুর সংখ্যা বাড়ল। বহুদূরে ক্যাম্প।

ধুঁকতে ধুঁকতে রাত নটার পর পৌঁছলাম ক্যাম্পে। শোরগোল পড়ে গেল। ঘিরে ধরল ফৌজি জওয়ানরা। কোথায় ছিলাম, কেন এত দেরি হল, জবাব দিতে দিতে জেরবার হয়ে গেলাম। আমাদের আগে শেষ তীর্থযাত্রী পৌঁছে গেছে ঘণ্টা তিনেক আগে। দেখাতে হল অমরনাথ যাত্রীদের জন্য ইস্যু করা গভর্নমেন্টের ফটো আইডেন্টিটি কার্ড। আমাদেরকে চিনতে পারলেন কলকাতা থেকে যাওয়া অন্য কয়েকজন তীর্থযাত্রী। রেহাই মিলল সামরিক জেরা থেকে।

ক্যাম্পের লঙ্গর থেকে অল্প কিছু খেয়ে খুঁজে খুঁজে বের করলাম আমাদের বরাদ্দ টেন্ট। টেন্ট নাম্বার টোয়েন্টি। টেন্টের বাইরে পাথর দিয়ে ঘেরা ঘোড়ার আস্তাবল। টেন্টের ভিতর খাটিয়ার ওপর পুরনো জরাজীর্ণ কম্বল পাতা। এক রাতের ব্যাপার। আজ এখানেই রাত্রিযাপন করতে হবে। তীর্থযাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন বিনা সিদ্ধি নাস্তি।

আজ বৃহস্পতিবার। ১২ জুলাই। খাটিয়ায় শুয়ে আছি। ঘুম এল না। শীতল রাত্রি। ওপরে জীর্ণ কম্বলে ঠান্ডা কিছুটা আটকালেও তলা দিয়ে ঠান্ডা উঠছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পার করলাম রাত্রি।

১৩ জুলাই অর্থাৎ ঠিক পরের রাত্রেই এই শেষনাগ ক্যাম্পে উগ্রপন্থী আক্রমণ হয়। অমরনাথ যাত্রার ইতিহাসে এই প্রথম। আমাদের কয়েকটা টেন্ট পরে প্রথমে ঘটায় বিস্ফোরণ। চারপাশ থেকে জওয়ানরা ছুটে এলে সি আর পি এফ-এর ডেপুটি কমান্ডারকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে গুলি করে মারে, চারপাশে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আমার টেন্টে সেই রাতে যারা ছিল তারা মারা যায়। অনেকে হতাহত হয়, এমনকী অনেক কাশ্মীরি ঘোড়াওয়ালা এবং পোর্টারও।

কর্ডন করে ফেলে সেনা জওয়ানরা তিনজনের মধ্যে দুজন উগ্রপন্থীকে গুলি করে মারে। তৃতীয়জন অন্ধকারে আত্মগোপন করে পাল্টা গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। শেষে তাকেও চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে পাথরে ঘেরা ঘোড়ার আস্তাবলে, আমার টেন্টের ঠিক বাইরে। তাকেও মারা হয়। এক রাতের ব্যবধানে বেঁচে যাই এই নারকীয় হত্যালীলা থেকে। অবশ্য এসবই জেনেছি অনেক পরে।

পঞ্চতরণী ট্রেক

ভোর পাঁচটায় উঠে পড়লাম। ঘুম বিশেষ হয়নি। বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকার থাকতেই। আজ সারাদিন ট্রেক করে দিনের শেষে পরের ক্যাম্প, পঞ্চতরণী।

শীতল অন্ধকার পথে এখন আমি একাই। কমলেশ পরে বেরুবে। ও হয়তো ঘোড়া নিয়ে নেবে। শরীর ভাল বোধ করছে না। দুজনে মিলব পঞ্চতরণীতে। সেরকমই কথা হয়ে রইল।

ট্রি লাইনের ওপর দিয়ে চলেছি। শীতল অন্ধকার পথ। হিমশীতল বাতাস বইছে। ধীরে ধীরে ফুটছে দিনের আলো। ঊষালগ্ন, ব্রাহ্মমুহূর্ত। ধ্যানমগ্ন শান্ত হিমালয়। চারপাশের পর্বতচূড়ায় বরফের আভাস। অলৌকিক, অপার্থিব অনুভূতি। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ধীরে ধীরে বাড়ছে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা, বেলা

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। অনেকেই ঘোড়ার পিঠে। পথের দুধারে পাহাড়ের ওপর জওয়ানরা অতন্দ্র প্রহরায়।

সারাদিন পথ চলা, চড়াই উৎরাই বেয়ে এগিয়ে চলা। কোথাও বা পথের ধারে লঙ্গর। বিনা পয়সায় ক্ষুণ্ণিবৃত্তি। সারা ভারত থেকে এসেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ভলান্টিয়ার, তীর্থযাত্রীদের সেবা করার জন্য। তীর্থযাত্রীরা চলেছে গুহার পথে, কৃচ্ছ্রসাধন করে পুণ্যলাভের আশায়। তীর্থযাত্রীদের সেবা করে পুণ্যলাভের আশায় এসেছে ভলান্টিয়াররা।

বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য অস্তাচলের পথে। একটি প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলেছি। দুপাশে বহু দূরে দুই মাউন্টেন রেঞ্জ। বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটছি উপত্যকার মধ্য দিয়ে। একটি সময়ে বুঝতে পারলাম যত এগোচ্ছি, তত পর্বতশিরা দুটি কাছাকাছি আসছে, দূরত্ব কমছে। এক সময়ে খুবই কাছে চলে এল। একটি ফানেলের মতন। শেষে দুটি পর্বতশিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে গেল।

দুই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সরু একটা পাস। গুহার মতন। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে ওপারে যেতে হবে। ওপারে পঞ্চতরণী। একটি নদী গ্লেসিয়ার থেকে বেরিয়ে পাঁচটা ধারায় ভাগ হয়ে বয়ে চলেছে, তাই পঞ্চতরণী। আর একটা দ্যোতক আছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের প্রতিভূ এই খরস্রোতা নদী। পার্বত্য নদীর ওপরে বোল্ডারের ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে তৈরি সাময়িক সেতু, অত্যন্ত বিপজ্জনক। নদীর ওপারে ক্যাম্প। আজ রাতের হল্ট।

দুই পাহাড়ের মধ্যে পাসে ঢুকতে গিয়ে চমকে উঠলাম। ওপর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল 'হল্ট'। সেই মুহূর্তে আমি একা। আমার পেছনে যারা, তারা অনেক পেছনে। সামনে যারা, তারা পাস পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে।

চমকে ওপর দিকে তাকালাম। মাথার ওপরে পাথরের আড়াল থেকে ইনস্যাস তাক করে এক ফৌজি জওয়ান। জিজ্ঞাসা করল, ''কাঁহাসে আয়া?'' ''কলকাত্তা সে।'' পরের প্রশ্ন, ''কলকাত্তা কা কাঁহা সে?'' বললাম, ''সল্টলেক সে।'' এরপর যেটা ঘটল সেটার জন্য আরও-ই প্রস্তুত ছিলাম না। প্রশ্নকর্তা রাইফেলের নল অন্যদিকে ঘুরিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, ''ঠিক আছে, যান।'' আমি হতভম্ব। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''দাদা কি বাঙালি?'' ফৌজি কিছুটা বিরক্তির সুরে বলল, ''হ্যাঁ হ্যাঁ, যান।'' বলে আমার পিছনে রাইফেল তাক করল, পরের যাত্রীকে আটকাবার জন্য।

পাস পেরিয়ে ওপারে এলাম। আর কিছুটা দূরেই পঞ্চতরণী। কিন্তু আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল একদল জওয়ান। অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে ধরল, সামনে এবং পেছনে। প্রত্যেকের রাইফেলের নল আমার দিকে তাক করা। ম্যাড্রাস রেজিমেন্ট। সঙ্গে স্নিফার ডগ। কম্যান্ডার আমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করতে লাগল—''কাঁহা সে আয়া'', ''কব নিকলা,'' ''কওন ট্রেন সে আয়া,'' ''জম্মু কব আয়া''—ইত্যাদি। আমার কোমরের পাউচের চেনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়েছিল টর্চের পেছন দিকটা। ছোট বিদেশি টর্চ। কিছুটা অন্যরকম। সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''উও কেয়া? নিকালো।'' আমি যখন পাউচের চেন খুলে টর্চটা বের করছি, পরিষ্কার বুঝলাম জওয়ানরা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। আমার দিকে তাক করা রাইফেলের সেফটি ক্যাচ লক করল। যাই হোক, টর্চের চেহারা দেখিয়ে নিশ্চিন্ত করলাম। টর্চ খুলে দেখাতে হল যে সত্যিই ব্যাটারি ছাড়া আর কিছু ভরা নেই। আমার সঙ্গে যখন এত কিছু চলছে, তখন কিছু দূরে আর এক দল ফৌজ এক সাধুকে নিয়ে পড়েছে। সাধুর ঝোলা চেক করে, জটা খুলিয়ে সার্চ করছে। পরে শুনেছিলাম, সাধুর ভেক ধরে জটার মধ্যে গ্রেনেড নিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়েছে উগ্রপন্থী। *ক্রমশ*